চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন, নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানী

১৯২৮ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি লন্ডনের 'নেচার' পত্রিকায় সি. ভি. রামন এবং কে. এস. কৃষ্ণাণ 'এ নিউ টাইপ অব সেকেন্ডারি রেডিয়েশন' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে যে নতুন ধরনের আনুষঙ্গিক বিকিরণের আবিষ্কার ঘোষণা করা হয়েছিল তাই এখন রামন-কৃষ্ণান প্রক্রিয়া নামে বিখ্যাত। বিগত ষাট বছরের পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের নানা অংশে এই প্রক্রিয়ার ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। সম্প্রতি লেজারের মাধ্যমে রামন-রশ্মি পাওয়ার পর থেকে তার প্রয়োগের পরিধি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন গ্যাসের ঘনত্ব ও তাপমাত্রা নির্ধারণে, দ্রুত রাসায়নিক বিক্রিয়াগতি গবেষণায়, বায়ু ও পানিদূষণ মাপায়, ড্রাগ এনজাইম বিক্রিয়ার ব্যাখ্যায়, অর্ধপরিবাহী বস্তুর প্রযুক্তিতে, দৃষ্টি শক্তির প্রক্রিয়া আলোচনায় এবং আরো অনেক ক্ষেত্রে রামন-কৃষ্ণান প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হচ্ছে।

ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের ত্রিচনোপল্লীর নিকটবর্তী এক গ্রামে চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা চন্দ্রশেখর আয়ার এবং তাঁর মাতা পার্বতী আম্মলের আটটি সন্তানের দ্বিতীয় চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন নোবেল পুরস্কার পান ১৯৩০ সালে এবং প্রথম সন্তান সুব্রহ্মণিয়নের পুত্র চন্দ্রশেখর ঐ পুরস্কার পান ১৯৮৩ সালে। রামনের বয়স যখন চার তখন তাঁর পিতা বিশাখাপত্তনের একটি কলেজে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত এবং ভৌত ভূগোলের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এখানেই নীল বঙ্গোপসাগরের তীরে রামনের স্কুলজীবন শুরু হয় এবং এখানে থেকেই ১৯০৩ সালে ইন্টারমেডিয়েট পাস করে তিনি চলে যান মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে। এই কলেজ থেকেই রামন ১৯০৪ সালে বি. এ এবং ১৯০৭ সালে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন।

এম.এ. পড়ার সময়েই রামন পদার্থবিজ্ঞানের বিখ্যাত পত্রিকা, 'ফিলজফিকাল ম্যাগাজিন'-এ দুটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, যার বিষয়বস্তু ছিল আলোর বিবর্তন এবং তরল পাদার্থের পৃষ্ঠটান। সুতরাং বলা যায় যে, রামন বিজ্ঞানী হওয়ার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন ভারতে বিজ্ঞান গবেষণার কোন সুযোগ ছিল না এবং তাঁর পক্ষে স্বাস্থ্যগত কারণে ইংল্যান্ড যাওয়াও সম্ভব ছিল না। তাই রামন ১৯০৭ সালের জুন মাসে সহকারী একউন্ট্যান্ট জেনারেলের চাকরি নিয়ে কলকতা চলে এলেন।

কলকাতায় রামনের প্রথম 'আবিষ্কার' হল ২১০ নং বৌবাজার স্ট্রিটের 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স' বা বিজ্ঞান সভাগৃহ। প্রতিষ্ঠাতা মহেন্দ্রলাল সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র অমৃতলাল সরকার অনেক দিন ধরে একজন নিবেদিতপ্রাণ গবেষক খুঁজছিলেন। রামনের আগমনে তাঁর সেই প্রত্যাশা পূরণ হল।

বাংলাইন্টারনেট কম

১৯৩২ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরে রামন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ গবেষণা কর্মগুলো সম্পন্ন করেন এই কলকাতা শহরেই। বিজ্ঞান সভা তাঁর জন্য ছিল অবারিত দ্বার (তাঁর বাসা থেকে একটা আলাদা দরজাও ছিল) এবং এখান থেকেই তিনি শব্দ ও আলোকবিজ্ঞানের ওপর বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রবন্ধ বিদেশের পত্রিকায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কলকাতা দু'জন দক্ষিণ ভারতীয় মনীষীকে লালন-পালন করেছিল— সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ও চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন। এ দু'জনই বলা যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'আবিষ্কার', কেননা তিনি এঁদের দু'জনকে যথাক্রমে 'পঞ্চম জর্জ দর্শনের চেয়ার' এবং পদার্থবিজ্ঞানের 'পালিত অধ্যাপকের চেয়ারে' আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন।

১৯২১ সাল আশু মুখার্জির পীড়াপীড়িতেই রামন অক্সফোর্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কংগ্রেস-এ যোগদান করার জন্য ইংল্যান্ড যান এবং তখনই তিনি ভূমধ্যসাগরের অবিশ্বাস্য নীল রঙ দেখে চমৎকৃত হয়ে যান। বিখ্যাত ইংরেজবিজ্ঞানী লর্ড র‍্যালে এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'গভীর সমুদ্রের অতি প্রশংসিত ঘন নীল রঙের সঙ্গে পানির রঙের কোন সম্পর্ক নেই, এটা আসলে আকাশের নীল রঙের প্রতিফলন মাত্র।' জাহাজে বসেই একটি 'নিকল' ত্রিশিরা নিয়ে একটা সহজ পরীক্ষা করে রামন বুঝতে পেরেছিলেন যে, লর্ড র‍্যালের এ ধারণা ভ্রান্ত।

তখন থেকেই আলোক বিক্ষেপণের ওপর রামনের সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল। ১৯২২ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি বই প্রকাশ করেন, যার নাম ছিল 'আলোর আণবিক বিক্ষেপণ'।

১৯২৩ সালে আমেরিকায় আর্থার কম্পটন পদার্থের আধামুক্ত ইলেক্ট্রন থেকে রঞ্জনরশ্মির বিক্ষেপণ প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। এই তথাকথিত কম্পটন বিক্ষেপণের ফলে রঞ্জনরশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য সুনির্দিষ্টভাবে পরিবর্তিত হয় এবং এই প্রতিভাসের ব্যাখ্যা কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে দেয়া যায়।

সুতরাং প্রশ্ন হল এই যে, রঞ্জনরশ্মি না নিয়ে আমরা যদি সাধারণ দৃশ্যমান আলো নেই তাহলেও কি বিক্ষেপণের ফলে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ঘটবে? এটাই ছিল রামনের সমস্যা।

১৯২৩ সালে রামনের ছাত্র কে.আর. রামনাথন পানি থেকে আলোর বিক্ষেপণের ওপর পরীক্ষা করেন। রামনাথন বিক্ষিপ্ত আলোয় সবুজ আলোর সংকেত দেখতে পান যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেগুনি আলোর চেয়ে বেশি, কিন্তু রামন এবং রামনাথন ধারণা করেন যে, এটা আসলে 'দুর্বল প্রতিপ্রভা'। কোন বস্তু আলো শোষণ করে ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো বিকিরণ করলে তাকে বলে প্রতিপ্রভা। প্রতিপ্রভা সুপরিচিত ব্যাপার, নতুন কিছু নয়। কিন্তু এরপর গবেষণায় যোগ দিলেন রামনের শ্রেষ্ঠ ছাত্র কৃষ্ণান এবং কৃষ্ণানের তীক্ষ্ণ চোখেই ধরা পড়ে দৃশ্যমান আলোর আণবিক বিক্ষেপণ। ১৯২৮ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি দিনপঞ্জিতে কৃষ্ণান লিখছেন, 'কোন কোন জৈব তরল পদার্থে অতিবেগুনি আলোর প্রতিপ্রভার সমবর্তন (Polarisation) প্রমাণ করতে চেষ্টা করলাম। ঘটনাক্রমে আবিষ্কার করলাম যে, সব তরল পদার্থই দৃশ্যমান আলোকেও তীব্র প্রতিপ্রভা দেখায় এবং যা সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য তা হল এই যে, এর সবগুলোই তীব্র সমবর্তন গুণসম্পন্ন।' আসলে আণবিক বিক্ষেপণ প্রক্রিয়া এভাবে লেখা যায়, 'আপতিত আলোক শক্তি + অণুর প্রাথমিক শক্তি → বিক্ষেপত আলোক শক্তি + অণুর চূড়ান্ত শক্তি' এবং এটাই রামন-কৃষ্ণান প্রক্রিয়া। এই

১৯২৮ সালে কলকাতায় আর্নল্ড সমারফেল্ড (মধ্যে), সি.ভি রামন (ডানে) ও কে. এস কৃষ্ণান (বামে)।

প্রক্রিয়া প্রতিপ্রভা নয়, কেননা প্রতিপ্রভায় সমবর্তন ঘটে না কিন্তু আণবিক বিক্ষেপণে সমবর্তন ঘটে এবং সেটাই কৃষ্ণানের তীক্ষ্ণ চোখে ঐদিন সর্বপ্রথম ধরা পড়েছিল।

রামন প্রক্রিয়া বুঝতে হলে আমাদের বস্তুর গঠন এবং আলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু ধারণা থাকা প্রয়োজন। বস্তুর মধ্যে রয়েছে পরমাণু এবং কতগুলি পরমাণু মিলে তৈরি হয় অণু। প্রতিটি পরমাণুর মধ্যে রয়েছে একটি কেন্দ্রীন যা ধনবিদ্যুৎসম্পন্ন। কেন্দ্রীনের বাইরে রয়েছে ঋণবিদ্যুৎসম্পন্ন কতগুলি ইলেক্ট্রন। কেন্দ্রীনের আধান ইলেক্ট্রনগুলির মোট আধানের সমান, যাতে পরমাণুটি সামগ্রিকভাবে আধানহীন হয়। অণু গঠিত হয় যে পরমাণু দিয়ে সেই পরমাণুগুলির ইলেক্ট্রন এবং কেন্দ্রীন এমনভাবে বিক্রিয়া করে যাতে সব অণু-পরমাণু একত্রিত হয়ে বস্তুর মধ্যে অবস্থান করতে পারে। বস্তুর এই নকশা বা ছবি আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের প্রায় সবটা এবং পদার্থবিজ্ঞানের অনেকটা ব্যাখ্যা করতে পারে।

পরমাণুর ইলেক্ট্রনগুলির অবস্থা পরমাণুর শক্তি দিয়ে নির্ধারিত হয়। এই শক্তি বিচ্ছিন্ন পরিমাণে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হয় যা প্রতিটি পরমাণুর মৌলিক বৈশিষ্ট্য। ঐসব অবস্থা আসলে এক একটি স্থিতাবস্থা যার জীবনকাল খুব অল্পও হতে পারে বা অনেক বেশিও হতে পারে।

অন্যদিকে আলোক হল গতিময় বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তি অথবা সঞ্চরণশীল বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ। অর্থাৎ আলোর মধ্যে রয়েছে চলন্ত বৈদ্যুতিক এবং চৌম্বক ক্ষেত্র। যে স্থান দিয়ে এই বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র যায় তার প্রতিটি বিন্দুতে ক্ষেত্রপ্রাবল্য পর্যায়বৃত্তে পরিবর্তিত হয়। মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে এই ক্ষেত্র একই গতিবেগে চতুর্দিকে সঞ্চরণশীল হয় এবং এর জন্য কোন পৃথক বাহকের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আলোক যে বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তি দিয়ে তৈরি তা পুরোপুরি বা আংশিকভাবে বস্তুর মধ্যে শোষিত হতে পারে। এভাবে বস্তুর মধ্যে আলোকশক্তি ধরা পড়ে গেলে ইলেক্ট্রনগুলির অবস্থা পরিবর্তিত হয়। পরমাণু ঐ বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তি শোষণ করার পর আবার তা পুরোপুরি বা আংশিকভাবে বিকিরণ করে দিতে পারে। এমনকি পরমাণু তার নিজের শক্তিও কিছুটা ত্যাগ করতে পারে, যার ফলে যে পরিমাণ শক্তি শোষিত হয়েছিল তার বেশি নিঃসৃত হতে পারে। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে বস্তুর মধ্যে বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তি শোষিত বা নির্গত অবিচ্ছিন্নভাবে হয় না বরং তা এক একটি গুচ্ছে বা কোয়ান্টামে (ঝলকে) শোষিত বা নিঃসৃত হয়। প্রতিটি শক্তিগুচ্ছ একটি রাশি দিয়ে চিহ্নিত হয় এবং তা হল ঐ বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের স্পন্দন সংখ্যা সুতরাং প্রতিটি গুচ্ছের বা কোয়ান্টামের শক্তি হল স্পন্দন সংখ্যা এবং একটি ধ্রুবকের গুণফলের সমান— যে ধ্রুবকটিকে প্লাংকের ধ্রুবক বলা হয়, কেননা তিনি এটা আবিষ্কার করেছিলেন।

এখন ধরা যাক, কোন অত্যন্ত পরিশুদ্ধ বস্তুর মধ্য দিয়ে একটি আলোকরশ্মি পাঠানো হল যা একই স্পন্দন সংখ্যার বা একই রঙের। এই আলোক রশ্মির বেশির ভাগই বস্তুকে সরাসরি অতিক্রম করে যাবে। কিন্তু তার কিছু অংশ পথে যেসব অণু এবং পরমাণু পড়বে সেগুলি দিয়ে বিক্ষিপ্ত হতে পারে। লর্ড র‍্যালে গত শতাব্দীতে এই বিক্ষেপণ প্রক্রিয়া আলোচনা করেছিলেন এবং তিনি গণনা করে দেখেছিলেন যে, অনেক তরল পদার্থের ক্ষেত্রে আপতিত আলোক শক্তির প্রায় এক সহস্রাংশ বিক্ষিপ্ত হয় যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য আপতিত বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমান। অবশ্য বিক্ষিপ্ত শক্তির পরিমাণ আপতিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে।

১৮৭৮ সালে জার্মানির লোমেল তাঁর বিক্ষেপণের তত্ত্বে প্রথম দেখান যে, বিক্ষিপ্ত আলোর মধ্যে কিছু অংশ থাকবে যার স্পন্দন সংখ্যা আপতিত আলোর স্পন্দন সংখ্যা এবং বিক্ষেপণ মাধ্যমের অভ্যন্তরীণ বস্তুকণার স্পন্দন সংখ্যার যোগফলের সমান। ১৯২৩ সালে জার্মানির স্মেকাল এবং ১৯২৫ সালে ক্র্যামারস ও হাইসেনবার্গ তাত্ত্বিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে বিক্ষিপ্ত আলোর মধ্যে আপতিত বিকিরণের স্পন্দন সংখ্যার পরিবর্তন বিক্ষেপণ বস্তুর বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করবে। ১৯২৭ সালে ডিরাক তাঁর তাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁর তত্ত্বে লব্ধি স্পন্দন সংখ্যার যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তা হল এই যে, ঐ লব্ধি দুটি স্পন্দন সংখ্যার যোগ অথবা বিয়োগফল হবে, যার একটি বহিঃস্থ এবং অন্যটি অভ্যন্তরীণ। অর্থাৎ একটি আপতিত বিকিরণের স্পন্দন সংখ্যা এবং অন্যটি বিক্ষেপণকারী অণুর স্পন্দন সংখ্যা। রামন এই সব ভবিষ্যদ্বাণীর কথা জানতেন এবং তার মতো আরো অনেকেই তা জানতেন। এই 'স্পন্দন সংখ্যার সমাহার' পরীক্ষণের মাধ্যমে নির্ধারণের চেষ্টা অনেকেই করেছিলেন কিন্তু সফল হতে পারেননি। রামনই এক্ষেত্রে প্রথম সফল পরীক্ষণবিদ পদার্থবিজ্ঞানী।

রামন-প্রক্রিয়ার তত্ত্ব অল্প কথায় প্রকাশ করা যায় না। তবু বলা যায়, একটি অণুর ওপর আপতিত আলোক কোয়ান্টাম অণুর সর্বনিম্নাবস্থার উত্তেজিত অবস্থার সঙ্গে বিক্রিয়া করতে পারে। এখন সর্বনিম্নাবস্থায় ইলেক্ট্রনের সংখ্যা উত্তেজিত অবস্থার ইলেক্ট্রনের সংখ্যার চাইতে বেশি। সুতরাং সর্বনিম্নাবস্থার ইলেক্ট্রনের সঙ্গে বিক্রিয়ার সম্ভাবনাই বেশি এবং বিক্রিয়ার ফলে ইলেক্ট্রনের শক্তি আলোক-কোয়ান্টামের শক্তির সঙ্গে যোগ হয়ে ঐ পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এই বিক্ষুব্ধ অবস্থা অতি অল্পক্ষণের জন্যই স্থায়ী হয় এবং বিক্ষিপ্ত আলোক একই স্পন্দন সংখ্যা এবং একই শক্তিতে নিঃসৃত হওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। কিন্তু ইলেক্ট্রনের যদি কোন মধ্যবর্তী শক্তিস্তর থাকে তাহলে ইলেক্ট্রন আপতিত রশ্মির পুরোটা নিঃসৃত করবে না, কেননা কিছুটা শক্তি তা শোষণ করে নেবে এবং ফলে ইলেক্ট্রনটি সর্বনিম্নাবস্থার কিছুটা উপরে মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থান করবে।

অন্যদিকে যদি ইলেক্ট্রনটি আগে থেকেই সর্বনিম্নাবস্থার কিছু উপরে থাকে এবং তার সঙ্গে যদি আপতিত আলোকরশ্মির বিক্রিয়া হয় তাহলে ইলেক্ট্রনটির শক্তিস্তর আরো উপরে উঠে যাবে। তারপর ইলেক্ট্রনটি সর্বনিম্নবস্থায় ফিরে গেলে এমন আলোক কোয়ান্টাম নির্গত হবে যার স্পন্দন সংখ্যা আপতিত রশ্মির স্পন্দন সংখ্যার চেয়ে বেশি। এইভাবে রামন প্রক্রিয়ায় দু'ধরনের স্পন্দন সংখ্যার বিকিরণ নির্গত হবে যাদের স্টোকস এবং এন্টি-স্টোকস লাইন বলে। এই ধরনের রশ্মির বৈশিষ্ট্য হল যে, তারা সমবর্তন প্রতিভাস অবশ্যই দেখাবে। রামন এবং কৃষ্ণান এটাই আবিষ্কার করেছিলেন।

১৯২৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি রামন সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই আবিষ্কার ঘোষণা করেন এবং ১৬ মার্চ বাঙ্গালোরে দক্ষিণ ভারতীয় বিজ্ঞান এসোসিয়েশনের সভায় 'একটি

নতুন বিকিরণ' নামে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। কলকাতায় ফিরে এসে বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে দ্রুত বক্তৃতাটি ছাপিয়ে তিনি তা সারাবিশ্বে বিতরণের ব্যবস্থা করেন।

রামন-কৃষ্ণান প্রক্রিয়ার গুরুত্ব এই যে, এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করে মন্থর গতি অণুর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কম্পাঙ্কগুলো নির্ধারণ করা যায় যা অণুর গঠন বোঝার জন্য প্রয়োজন। এ কারণেই এ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ার ওপর প্রায় সাতচল্লিশ হাজার মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম তিনটি প্রবন্ধের দুটির লেখক রামন এবং কৃষ্ণান এবং নোবেল বক্তৃতায় রামন স্বীকার করেছেন যে, 'কৃষ্ণানই পরিবর্তিত বিকিরণের সমবর্তন খালি চোখে নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।' আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ১৯২৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে রিডার হিসেবে যোগ দেয়ার পর কৃষ্ণান আর কোন দিন রামন-কৃষ্ণান প্রক্রিয়ার ওপরে কোন গবেষণা করেননি।

১৯৩২ সালে রামন কলকাতা ছেড়ে বাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। তাঁর কলকাতা ত্যাগের জন্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং মেঘনাদ সাহাকে দোষারোপ করা হয়। কিন্তু তিনি নিজে কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী ছিলেন সে কথা বোধ হয় ঠিক নয়। বাঙ্গালোরের ইনস্টিটিউট পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাঁর বিরুদ্ধে অসন্তোষ জমা হয়েছিল এবং এক পর্যায়ে তিনি অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেন। ১৯৪৮ সালে ষাট বছর পূর্ণ হলে তিনি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁর জন্য বিশেষভাবে সৃষ্ট রামন গবেষণা ইনস্টিটিউটে যোগদান করেন।

বাঙ্গালোরে তাঁর এবং তাঁর সহকর্মীদের গবেষণার বিষয় ছিল রঞ্জনরশ্মির মাধ্যমে কেলাস বিক্ষেপণ, হীরকের গঠন, ঝারি গতিবিদ্যা ইত্যাদি। এ সময়কার উচ্চ কম্পনের শব্দতরঙ্গ দিয়ে দৃশ্যমান আলোর বিক্ষেপণ সম্পর্কে রামন-নাথ তত্ত্ব সুধীসমাজে যথেষ্ট সমাদৃত। কিন্তু তাঁর অনড় মতবাদ অনেক সময় অপ্রীতিকর বিতর্কেরও সৃষ্টি করেছে। কোন কোন হীরক কেলাসের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত 'লাউত্র বিক্ষেপণ' নিয়ে তাঁর সঙ্গে ক্যাথলিন লনসডেলের কলহ, ঝারি গতিবিদ্যার ক্ষেত্রে ফন কার্মান-ম্যাক্স বর্ণ তত্ত্বের বিরুদ্ধে তাঁর অযৌক্তিক দাবি অনেক সময় বৈজ্ঞানিক রীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। এমনকি তাঁর একজন প্রিয় ছাত্রও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, রামন তাঁর গবেষণা প্রতিষ্ঠানে তাঁর নিজস্ব তত্ত্ব ছাড়া অন্য কোন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনাও পছন্দ করতেন না। মেঘনাদ সাহার সঙ্গে তাঁর তিক্ত সম্পর্ক ভারতীয় বিজ্ঞানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে বলা যায়। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্মস্থল কলকাতা এবং বাঙালিদের সম্বন্ধেও তিনি শেষ বয়সে নানা বিরূপ মন্তব্য করতেন বলে শোনা যায়। অবশ্য বাঙালিদের সম্বন্ধে এই ধরনের স্পর্শকাতরতা উপমহাদেশে সাম্প্রতিককালের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের মধ্যেও দেখা যায়।

তবুও একথা সত্য যে, চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন বিজ্ঞানী হিসেবে নিঃসন্দেহে একজন প্রথম সারির ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং তাঁর গবেষণার ঐতিহ্য অনুসরণ করেই ভারত আজ বিজ্ঞান জগতে অন্যতম স্বীকৃত শক্তি। বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন ১৯৭০ সালের ২১ নভেম্বর বাঙ্গালোরে পরলোকগমন করেন।

বাংলাইন্টারনেট.কম